মাসিক

সোমবারে সঙ্কট

বর্ষ ১, সংখ্যা ৪

২৬ মে, ২০২৫ । ১২ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২

মাসিক সোমবারে সঙ্কট

মে সংখ্যা

প্রকাশকাল
২৬শে মে, ২০২৫
১২ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২

সম্পাদক
আলী রাইহান স্বপ্ন

সহ সম্পাদক
মৃন্ময় দাস

শিল্প সহযোগিতায়
ফারজানা ইয়াসমীন

প্রচার সহযোগিতায়
জেরিন রিশামনি জিম

মিডিয়া টেক টিম
অসীম রায়
সাইমুন সোহেল আবির
কানিজ সুমাইতা প্রথা

সম্পাদকীয়

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের পথচলা। তৃতীয় সংখ্যার সাফল্যের পর উন্নতির প্রচেষ্টায় আরেকটু নিজেদের শুধরে নিয়ে, নিয়ে এলাম আমাদের চতুর্থ সংখ্যা। প্রতি সংখ্যার মতো এ সংখ্যাতেও থাকছে নিয়মিত বিভাগ এবং ধারাবাহিক গল্প সমূহ। সাথে থাকছে এবারের বিশেষ আয়োজন সিরিয়াল কিলিং নিয়ে লেখা প্রচ্ছদ রচনা এবং রোমাঞ্চকর গল্প।

আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবারের সংখ্যা। এবং আমরা চেষ্টা করব আপনাদের আরো রোমাঞ্চকর রচনা উপহার দেওয়ার।

আপনাদের প্রতিটি মুহূর্ত হোক আরেকটু রোমাঞ্চকর।

Ali Raihan Swpno

আলী রাইহান স্বপ্ন

মাসিক সোমবারে সঙ্কট
বর্ষ ১, সংখ্যা ৪
ইমেইলঃ mondaycrisis0824@gmail.com
ফেসবুকঃ
https://www.facebook.com/mondaycrisis

সূচিপত্র

মুখোশ

অসীম রায়

শীতের রাত। বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে চলছে নিউ ইয়ারের পার্টি। শ্যাম্পেনের গ্লাসে ঠনঠন শব্দ, উচ্ছ্বাসে ভরা হাসি–কেউ টেরও পায়নি, ওই একই সময়ে পাশের রাস্তার ডাস্টবিনে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ পড়ে আছে। গলায় পলিথিনের প্যাঁচ, ঠোঁটে জমে থাকা রক্তের দাগ আর বাঁ হাতে আঁকা একটি উল্কি। পুলিশ যখন এসে লাশ তুলে নেয়, পার্টির গান তখনও থামেনি...

এই নির্মম হত্যাকাণ্ড কোনো সাধারণ খুনের ঘটনা নয়। এ ধরনের ঘটনা এক একটি সিরিয়াল কিলারের স্বাক্ষর বহন করে–যে একের পর এক শিকারের পিছু নেয়, প্রতিটি হত্যাকে পরিণত করে এক বিকৃত শিল্পকর্মে। সিরিয়াল কিলাররা সমাজকে একইসাথে ভয় ও কৌতূহলে আচ্ছন্ন করে। তাদের অপরাধ শুধু হিংসাত্মক ঘটনা নয়, বরং গভীর মানসিক ব্যাধির সুপরিকল্পিত প্রকাশ। জ্যাক দ্য রিপার থেকে টেড বান্ডি পর্যন্ত, এই অপরাধীরা রেখে যায় ভয়, রহস্য এবং এক অদ্ভুত আকর্ষণের ছাপ।

এফবিআই-এর মতে, একজন সিরিয়াল কিলার এমন একজন ব্যক্তি যিনি ৩০ দিনের বেশি সময়ের ব্যবধানে তিন বা ততোধিক খুন করে থাকেন, প্রতিটি অপরাধের মাঝে একটি বিরতি থাকে। তারা গণহত্যাকারী বা ম্যাস মার্ডারারদের থেকে আলাদা, কারণ তারা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে এবং খুনের মাধ্যমেই এক ধরনের তৃপ্তি পায়। তাদের অপরাধের একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন থাকে এবং তারা সাধারণত কোনো অনুশোচনা বোধ করে না। বরং, তারা নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতার স্বাদ উপভোগ করে।

কিন্তু কী একজন মানুষকে বারবার খুন করতে প্ররোচিত করে? মনোবিজ্ঞানীরা কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। অনেক ধারাবাহিক খুনিই সাইকোপ্যাথ বা সোসিওপ্যাথ, যাদের সহানুভূতির অভাব থাকে এবং তারা অত্যন্ত কৌশলী হয়। সাধারণত, তাদের মধ্যে নার্সিসিজম দেখা যায়। অনেকেরই শৈশবে নির্যাতন বা অবহেলার ইতিহাস থাকে, যা পরবর্তীতে হিংস্রতায় রূপ নেয়। এরা সাধারণত খুনের আগে দীর্ঘদিন ধরে কল্পনায় সেই দৃশ্য কল্পনা করে। খুনের পেছনে বিভিন্ন উদ্দেশ্য কাজ করে। কেউ কেউ ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য খুন করে, যেমন ডেনিস রেডার (বিটিকে কিলার)। কেউ মানসিক তৃপ্তির জন্য, যেমন এডমন্ড কেম্পার। আবার কেউ বিশ্বাস করে যে তারা সমাজ থেকে অপ্রয়োজনীয়দের সরিয়ে দিচ্ছে, যেমন অ্যান্ড্রু কুনানান।

ইতিহাসে সিরিয়াল কিলিংয়ের নজির প্রাচীনকাল থেকেই পাওয়া যায়। গিল দে রাইস (১৪০০-এর দশক) নামক এক ফরাসি অভিজাত শতাধিক শিশুকে নির্যাতন করে খুন করেছিলেন। এলিজাবেথ বাথোরি নামক এক হাঙ্গেরীয়ান কাউন্টেসকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল যুবতীদের রক্তে স্নান করার জন্য। আধুনিক যুগে, জ্যাক দ্য রিপার (১৮৮৮) লন্ডনের পতিতাদের লক্ষ্য করে অস্ত্রোপচারের মতো নিখুঁতভাবে খুন করতেন। এইচ. এইচ. হোমস (১৮৯০-এর দশক) নামক এক আমেরিকান খুনি তার "মার্ডার ক্যাসেল"-এ টর্চার রুম বানিয়েছিলেন।

১৯৭০ থেকে ১৯৯০-এর দশককে ধারাবাহিক খুনিদের "সোনালি যুগ" বলা হয়, কারণ এই সময়ে টেড বান্ডি, জেফ্রি ডাহমার এবং এইলিন ওয়ার্নোসের মতো কুখ্যাত খুনিরা সামনে আসে। টেড বান্ডি তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের আড়ালে ৩০ জনের বেশি নারীকে হত্যা করেছিল। জেফ্রি ডাহমার তার শিকারের দেহাংশ সংগ্রহ করত, আর এইলিন ওয়ার্নোস ছিলেন সেই বিরল নারী খুনিদের একজন, যিনি সাতজন পুরুষকে মেরেছিলেন।

অ্যান রুল-এর The Stranger Beside Me বইটি টেড বান্ডির এক বন্ধুর দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা, যে তার অপরাধ সম্পর্কে জানত না। জন ই. ডগলাসের Mindhunter বইটি এফবিআই-এর একজন প্রোফাইলারের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে লেখা। মিশেল ম্যাকনামারার I'll Be Gone in the Dark গোল্ডেন স্টেট কিলারকে খুঁজে বের করার চমকপ্রদ গল্প বলে। সমাজের এই অপরাধীদের নিয়ে আগ্রহের পেছনে কিছু কারণ আছে। তারা প্রায়শই নিরীহ মানুষ হিসেবে দেখা দেয়, যা তাদেরকে আরও ভয়ানক করে তোলে। তাদের অপরাধের রহস্য ও নৃশংসতা মানুষের কৌতূহল জাগায়।

এজন্য এই বিষয়ে প্রচুর বই লেখা হয়েছে। হ্যানিবাল লেক্টারের মনের গভীর থেকে ঘুরে আসতে পড়তে পার The Silence of the Lambs (টমাস হ্যারিস)। ব্রেট ইস্টন এলিস-এর American Psycho এক সাইকোপ্যাথের জগৎকে বর্ণনা করেছে। আর এরিক লারসন-এর The Devil in the White City শিকাগো ওয়ার্ল্ড ফেয়ারের পটভূমিতে এইচ. এইচ. হোমসের অপরাধকে রোমাঞ্চকরভাবে উপস্থাপন করেছে।

সিরিয়াল কিলাররা মানব মনের এক অন্ধকার দিককে প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের অপরাধ আমাদের সমাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে বাধ্য করে, সমাজের ব্যর্থতা নিয়ে ভাবতে শেখায়। এই খুনিরা সমাজের আয়নায় এক বিকৃত প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তোলে। তাদের অস্তিত্ব আমাদের জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য করে—আমরা কি আসলেই সভ্য? নাকি আমাদের ভেতরেই লুকিয়ে আছে সেই আদিম হিংস্রতা? প্রতিটি কেস স্টাডি, প্রতিটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমাদের একটু একটু করে কাছে নিয়ে যায় সেই উত্তরের, যা হয়তো আমরা কখনোই শুনতে চাই না।

বর্ণচোরা

মৃন্ময় দাস

(২য় পর্ব)

আমি বাইকে উঠে এক টানে চলে এলাম বনানীর একমাত্র নাইট ক্লাব হোটেল "হোটেল রেডরুফ" এ। ভিতরে ঢুকে দেখি রিসিপশনে এক সুন্দরী নারী বসে আছে। মনে মনে বললাম ইভিনিং শিফট তো শুরু হয়েই গেছে। যাইহোক, সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই উঠে দাঁড়ালো। কার্ড দেখিয়ে ম্যানেজারকে ডাকতে বললাম। দু'মিনিটের মধ্যেই একজন মধ্য বয়সী লোক দ্রুত পায়ে এলেন। এসে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলেন, দেখেই বুঝলাম দৌড়ে এসেছেন। আমাকে দেখেই বললেন, "স্যার, আমি ম্যানেজার সুমন, আমাদের তো লাইসেন্স রিনিউ করা হয়েছে এবং সব কাগজপত্র ঠিক আছে। আর আমাদের এখানে তো কোনো সমস্যাও হয়নি.... .... তাহলে আপনি হঠাৎ?"
দ্রুত এতো কথা বলে আরো হাঁপাতে লাগলেন।
আমি বললাম, "বসুন, আপনার কি হাঁপানি আছে নাকি?"
- না স্যার, ওই আর কি।
যেভাবে ঘামছেন তাতেই বুঝলাম অন্য কোনো ঝামেলা আছে। যাইহোক সেই তদন্ত পরে করা যাবে।
- রবিনকে চিনতেন?
- হ্যা স্যার, বড্ড ভালো মানুষ ছিলেন। আমাদের রেগুলার কাস্টমার ছিলেন।
- ভালো মানুষ ছিলেন! তা কেমন ভালো শুনি।
- জ্বী স্যার?!
খুব অপ্রস্তুতভাবে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন।
- বুঝতে পেরেছি, এবার বলুন, রবিনের খুন এখানকার ক্লাবেই হয়েছে তো, তাই না?
- হ্যা স্যার, কি যে বিরক্তিকর একটা রাত ছিল সেদিন।
- যা হয়েছিল, সব বিস্তারিতভাবে বলুন একদম প্রথম থেকে।
- ১১ জানুয়ারি, সোমবার ছিল দিনটা, এখনও মনে আছে কারণ শুধু ওই খুন নয়, আমার স্ত্রীর জন্মদিন ছিল সেদিন। আমি সেদিন আগে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখনই হঠাৎ ক্লাবে গ্যাঞ্জাম লেগে যায়। এক ছেলে নাকি এক মেয়ের সাথে বেয়াদবি করছিল। তখন আটটার মতো বাজবে হয়তো। ওই ঝামেলা মিটিয়ে ওদের বের করে দেওয়ার পর ক্লাবের বাথরুমে হঠাৎই জল লিক করা শুরু করে, আমি বুঝতে পারি আমার আর যাওয়া হবে না আগে। আমাদের এখানে দুজন ম্যানেজার। আমার দিনে বারো ঘন্টা আর আরেকজন মানে পলাশের রাতে। আমাদের শিফট চেঞ্জ হয় দশটায়। সেদিন পলাশ ও চলে এসেছিল কারণ আমি ওকে বলেছিলাম সেদিনে একটু আগে বের হবো। যাইহোক সব মিটিয়ে ভিড় সামাল দিতেই পৌনে দশটা বেজে যায়। সেদিন রাতেও বেশ ভিড়। সার্ভারদের নিয়ে

টানাটানি। এরপর দ্রুত ক্লাব থেকে বের হওয়ার সময়েই আমার সাথে ধাক্কা লেগে যায় এক লোকের সাথে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো সাথে সাথেই লোকটা ভিড়ে হারিয়ে যায়। কালো হুডি পড়া ছিল। মনে থাকার কারণ হলো এই গরমে ক্লাবে হুডি পড়ে কে আসে! এরপর আমি পলাশকে চাবি বুঝিয়ে দিয়ে রাস্তার মোড়ে যেতে না যেতেই ফোন করে ডাক যে রবিন মারা গেছে। এবার দ্রুত আসতে গিয়ে আরেকজনের সাথে ধাক্কা। এবার মাটিতেই পড়ে গেলাম। লোকটার মাথায় সাদা ক্যাপ আর গায়ে লাল টি শার্ট ছিল। এ ব্যাটাও ধাক্কা মেরেই দৌড়ে পালালো। এরপর তো ভিতরে গিয়ে দেখি সব একদম নিশ্চুপ হয়ে আছে। বার টেবিলের উপর মাথা রেখে পড়ে আছে রবিন। আর পলাশ পুলিশকে ফোন করছে।

- কালো হুডি পড়া বা সাদা ক্যাপের লোকটা কারো কি মুখ মনে আছে?

- স্যার, অন্ধকারে তো দেখতেই পারিনি চেহারার দিকে, মনে আর কি রাখবো।

- সেদিন বারে রবিনকে ড্রিংক্স কে সার্ভ করছিল? তাকে ডাকো।

- স্যার ও তো এখনও আসেনি। ছয়টায় ওদের শিফট শুরু হয়।

- ঠিক আছে, ততক্ষণ তাহলে আমাকে ক্লাব রুম পুরোটা, সিসিটিভি ফুটেজ আর যেখানে মারা গেছিল ওই জায়গা টা দেখান।

- এদিকে আসুন স্যার।

ম্যানেজার সুমনের সাথে গিয়ে সব দিকে চোখ বুলাতে লাগলাম আর চিন্তা করতে লাগলাম কি সুন্দর খুনের যায়গা বেছে নিয়েছে। সবাই নিজেদের নিয়ে মত্ত আর আলো আঁধারে ঠিক করে বোঝার ও উপায় নেই পূর্ব পরিচিত না হলে। সিসিটিভি ভালো করে দেখেও কোনো লাভ হলো না। হুডি আর ক্যাপের আড়ালে চেহারা একদম বোঝা যাচ্ছে না। এরপর এক সোফায় বসে নিজে একটা রেড ওয়াইনের গ্লাস নিয়ে চুমুক দিতে লাগলাম। আর ম্যানেজারকে বলে দিলাম সার্ভার আসলে আমাকে শুধু দেখিয়ে দিতে ওনাকে কিছু বলার দরকার নেই। একটু পরেই ম্যানেজার এসে দেখিয়ে দিলো, বার টেবিলের এক মাঝারি উচ্চতার ছেলের দিকে। ওর সামনে গিয়ে বসে গ্লাসটা ভর্তি করতে বললাম। গ্লাস নেওয়ার সময় ওর হাতে একটা চিরকুট দিয়ে দিলাম। এরপর চুমুক দিয়ে জানতে চাইলাম,

- সেদিন রাতে কি হয়েছিল?

- স্যার, রবিন সাহেব আমার সামনেই বসে ছিলেন। দশটা বাজার কিছু আগে এক লাল টি শার্ট পড়া লোক এসে রবিন সাহেবের ড্রিংক্স অর্ডার করে। এরপর সময় শুনতে চায়। আমি ঘড়িতে তাকিয়ে সময় বলতেই গ্লাস হাতে উঠে চলে যায় আর যাওয়ার সময় রবিন সাহেবের কাঁধে দুবার ট্যাপ করে যায়, ওহ্যা, ততক্ষণ উনি অন্য দিকে তাকিয়ে নাচ দেখছিলেন।

- ঠিক আছে, আমি আজ তাহলে আসি। পরে দরকার হলে এবার থানায় ডাক পড়বে কিন্তু। সাবধানে থেকো।

কথা শেষ করে গ্লাস খালি করে উঠে চলে আসি। বাইরে বের হয়ে দেখি অন্ধকার হয়ে গেছে। আর মনে হলো পিছনে কেউ আছে, পিছনে তাকাতে যাবো তখনই ফোন বেজে উঠল। সুধির ফোন করেছে। ধরতেই বলল, "স্যার, রতন দা'র দোকানে আসুন কথা আছে।" আমিও ফোন রেখে বাইক নিয়ে বেড়িয়ে গেলাম। আর যেতে যেতে লুকিং গ্লাসে দেখে নিলাম কালো শার্ট পড়া এক পাতলা ছোকরা চেয়ে থেকে দেখছে।

(চলবে)
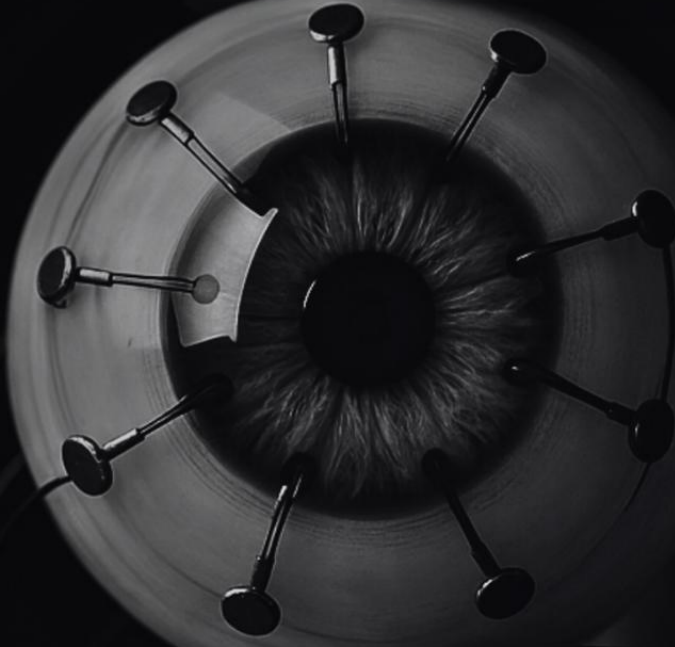
THRILLING FACTS

বিজ্ঞানের বদৌলতে অন্ধত্বের অন্ধকারে আটকে থাকা মানুষ-দের জন্য বিজ্ঞান এনে দিয়েছে নতুন আশার আলো। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি একটি বায়োনিক চোখ ইমপ্লান্ট তৈরি করেছেন, যা আংশিকভাবে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। বোস্টন রেটিনাল ইমপ্লান্ট প্রজেক্টের অধীনে ২০ বছরের গবেষণায় তৈরি এই যন্ত্রটি একটি পেন্সিলের মাথার মতো ছোট, কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর।

ম্যাসাচুসেটস আই অ্যান্ড ইয়ার ইনফার্মারির ড. জোসেফ রিজ্জো এবং এমআইটি-র অধ্যাপক জন ওয়ায়াট এই প্রকল্পটি পরিচালনা করছেন। তাদের লক্ষ্য—‘age-related macular degeneration’ ও ‘retinitis pigmentosa’ রোগে আক্রান্ত দৃষ্টিহীনদের সহায়তা করা। ইমপ্লান্টটি চোখের বাইরে স্থাপন করা হয় এবং একটি সরু তারের মাধ্যমে মস্তিষ্কে চাক্ষুষ সংকেত পাঠায়। এটি দীর্ঘদিন কার্যক্ষম থাকে ও শরীরের পরিবেশে টিকে থাকতে পারে।

যন্ত্রটি পুরোপুরি দৃষ্টিশক্তি ফেরাতে না পারলেও, বস্তু ও গতিশীলতা শনাক্ত করতে সাহায্য করে, যা চলাফেরা ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে স্বাধীনতা দেয়। বর্তমানে এটি মানবদেহে পরীক্ষার অপেক্ষায় এবং FDA অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় আছে।

জারুল গাছের অগোচরে

উপমা সরকার

"ওই বাড়িটার সামনে দাঁড়ালেই মনে হয়, কেউ যেন নিশ্বাস বন্ধ করে দেখছে..."–এই কথাটা শুনেই উপোর ভিতরে একটা কাঁপুনি দিয়েছিলো সেদিন। অথচ ভয়টা তাকে আটকে রাখতে পারলোনা।
নাকি সেই ভয়ই টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে আজ? রুহি আর শিফুর দিকে একবার তাকালো উপো। ওরা কি ভয় পাচ্ছে?
তারপর খানিকটা এগিয়ে গেলো জঙ্গলের ভেতরে সেই পুরনো, পরিত্যক্ত বাড়িটার দিকে।
জায়গাটার নামটাও কি ভীষণ অদ্ভুত নাহ্?
"সুংসুংগির মোড়"–শুনেই হাসি পায়। আবার জানতেও ইচ্ছে করে এই নামের পেছনের কাহিনী।
উপো মনে মনে ভাবলো–"ইসস্, কথাটার সাথে একটা হাহা ইমোজি জুড়ে দিতে পারলে মন্দ হতোনা, হেহে।"
একবার প্রকাণ্ড জারুল গাছের দিকে তাকিয়ে ওরা শ্বাস নিলো প্রাণ ভরে।
বাড়িটা অন্তত ৩০ বছরের পুরোনো তো হবেই। জন্ম থেকেই যাতায়াতের পথে এমন ভাবেই দেখে গেছে ওরা বাড়িটাকে।
একবার স্কুল থেকে ফেরার পথে ইমা বলেছিলো–বহু বছর আগে একদল উদ্ভট মানুষ নাকি থাকতো বাড়িটাতে। তারপর একদিন বাড়িটার সব দরজা হঠাৎই বন্ধ হয়ে যায়, ওদের অস্তিত্বও বিলিন হয় সেদিনই।
কিন্তু এটাও কি সম্ভব?
অনেকেই বলে ওরা নিজেরাই একে অপরকে খুন করেছিল সেদিন, অনেকে বলে সংঘবদ্ধ আত্মহত্যা। একদল বলে ওরা অভিশপ্ত।
"ভুতে বিশ্বাস করিস না তো?" শিফু বলল, ক্যামেরার ব্যাগটা গলায় ঝুলিয়ে।
উপো মাথা নাড়ল। "ভয় পাওয়ার জন্য না, সত্যিটা জানার জন্য যাচ্ছি আমরা, শিফু।"
খানিকটা এগিয়ে যেতেই জারুল গাছের আড়ালে হারিয়ে গেলো সুয্যি মামা। একটা অদ্ভুত চাপা শব্দ চারপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে তখনও।
বাড়িটার একেবারে সামনে পৌঁছাতেই তিনজন থমকে গেল। উপোর মনে হলো–বাড়িটা যেন তাদের অপেক্ষাতেই আছে।
"চল, ঢুকে পড়ি," রুহি ফিসফিস করে বলল।
তিনজন একসাথে পা রাখল সেই রহস্যের ভিতরে...
বাড়ির ভেতরে পা রাখতেই একটা ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগলো শরীরে। দেয়াল জুড়ে পুরনো সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টের পোস্টার, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বোতল, পুড়ে যাওয়া নোটবুক–সবকিছু তেই বিশ্রী গন্ধ।
অসহনীয় পরিস্থিতি।
কিন্তু ফেরার রাস্তা ততক্ষণে বন্ধ।
দরজাটা ভীষণ শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেছে হঠাৎই!
"দরজাটা কে বন্ধ করল?"–শিফু দৌড়ে গেল, কিন্তু বাইরে কেউ নেই।
সময়ের সাথে সাথে ঘটনাগুলো অস্বাভাবিক হতে লাগল।
জায়গাটার নাম কি ছিল যেন? এভারগ্রিন লজ।
হঠাৎ একটা ধাতব শব্দ। কল্পনার জগৎ থেকে বেরিয়ে এলো উপো।
দেয়ালে হঠাৎ ছায়া, কারো পায়ের শব্দ, বাতাসে অদ্ভুত কেমিক্যালের গন্ধ।
এ কি তবে ভুতের কাজ?
উপো ফিসফিস করে ওদের বললো–"ছায়াগুলো মানুষের মতোই আচরণ করছে, ভুতের মতো নয়।
"ভূতের মতো নয়? ভূত দেখেছিস বুঝি তুই? যত্তসব আজগুবি কথা। চুপ করে থাকতে পারিসনা নাকি?" রুহির ঝাঁঝালো স্বরে খানিকটা আড়ষ্ট হয়ে গেলো উপো।
ওদের হঠাৎ মনে হলো সবকিছু যেন খুব সাজানো।
"আমাদের ভয় দেখানো হচ্ছে, কিন্তু কেন?" – শিফু চুপচাপ বলল।
সন্ধ্যা নেমে এসেছে কিনা বোঝা যাচ্ছেনা কিছুতেই।
হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ পেছন ফিরে শিফু খেয়াল করলো রুহি নেই।
আজকে অন্তত রুহির বেপরোয়া আচরণ আশা করেনি ওরা।
একে-অপরের চোখের দিকে তাকালো শিফু আর উপো খানিকক্ষণ।
হঠাৎ একটা চিৎকার। কিন্তু ভীষণ মৃদু।
সম্ভবত নিচতলা থেকে চিৎকার করেছে কেউ।
উপোর মাথায় ক্রমাগত একটাই লাইন বেজে যাচ্ছে তখনো-
"I've become so numb."
কিচ্ছু না ভেবেই উপো আর শিফু দৌড়ে গেলো নিচে।
রুহিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন মুখ ঢাকা লোক।
শিফু এগিয়ে গেলো খানিকটা। তারপর মুহূর্তেই মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে।
সন্ধ্যা নেমেছে ততক্ষণে। ফেরার পথ খোঁজা এখন দুষ্কর। উপো কোনোমতে পালানোর রাস্তা খুঁজতে শুরু করে ঠান্ডা মাথায়। এখান থেকে না পালাতে পারলে, না বেঁচে থাকলে রুহি, শিফুর কি হবে?
হঠাৎ একটা কর্কশ গলায় কেউ বলে ওঠে –
"ও মেয়েটা অনেক বেশি দেখে ফেলেছে... এবার ওকেও শেষ করতে হবে।"

সন্তর্পণে খানিকটা জায়গা পেরিয়ে একটা খোলা জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিল উপো। শরীরে আঁচড়, হাতটা রক্তাক্ত। কিন্তু এখন চিন্তা একটাই – বাঁচতে হবে। শুধু তার নিজের জন্য নয়, রুহি আর শিফুর জন্যও।
বুক ধড়ফড় করছে, মুখে কাঁদা লেগে গেছে, কিন্তু থামার সুযোগ নেই। কেউ বা কিছু তাড়া করছে ওকে।
ও জেনে গেছে, এই জায়গা ভূতের নয়। সাজানো একটা থিয়েটার মাত্র – যার আড়ালে আছে কোনো রাঘব বোয়াল।
জঙ্গল পেরিয়ে উপো পৌঁছালো রাস্তার ধারে। আশেপাশে কেউ নেই।

উপো কাঁদছিল। "ওরা মানুষ খুন করছে! ওখানে আমার বন্ধুরা আটকা পড়ে আছে! আমি কি কিচ্ছু করবোনা?"
পেছন থেকে কেউ ফিসফিসিয়ে বললো –
"আমি জানি ওরা কে। আগে আমিও ওদের এক প্রজেক্টে ছিলাম; পালিয়ে এসেছি।
উপোর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।
"তুমি আমাকে ভিতরে নিয়ে যেতে পারবে?"
রাসেল মাথা নাড়ল। "সরাসরি নয়। কিন্তু একটা গোপন টানেল আছে, যা ওরা গোপন যাতায়াতের জন্য তৈরি করেছিল – ওটাতেই ঢোকা যাবে।"
পরদিন গভীর রাতে উপো আর সেই আত্মপরিচয় গোপন করা ছেলেটি আবার পা বাড়ালো বাড়িটার দিকে; ওদেরকে যে বাঁচাতেই হবে।
এবার উপো একা নয়। এসেছে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই।
গোপন টানেল দিয়ে ঢুকে ওরা পৌঁছালো যেখানে, জায়গাটা সম্ভবত কোনো ল্যাবরেটরির। এখানেই বন্দি রুহি আর শিফু। আর তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ – ডঃ জাফর, যাকে সরকার মৃত ঘোষণা করেছিল বহু বছর আগে।
"তোমরা আবার ফিরে এসেছো... দারুণ," তিনি হেসে উঠলেন।
"মানুষের ভয় আর শরীর – এই দুটোকে নিয়ন্ত্রণ করলেই পৃথিবী আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। তোমরা আমাদের নতুন জেনারেশনের অংশ হবে।"
উপো নিজের ভেতরের ভয়কে চেপে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তখনো...

(চলবে)

সায়াহ্নের আভা

আবু রায়হান

পূর্বাহ্নের চঞ্চলতা!
মধ্যাহ্নের প্রখরতা!
ছড়াতে পারি আমরা তাহা?

অপরাহ্নের সমাপ্তিকা!
সায়াহ্নের আবাসে ফেরা!
দিতে পারি নিশ্চয়তা?

যোজন দূরের নিঃসীমতা!
দূর নিবাসের বিষন্নতা!
ঘুচাতে পারি আমরা তাহা?

দিন ভরের কর্ম আশ!
ভর দুপুরে একটু আয়েশ!
দিতে পারি এই আশ্বাস?

মহাকাশের বিশালতা!
নিখিল বিশ্বের প্রসারতা!
মোদের কি আছে তাহা?

নীল সমুদ্রের গভীরতা!
গিরি-পাহাড়ের উচ্চতা!
জিনিতে পারি আমরা তাহা?

একটি স্নেহের কথা!
ঘুচাইতে পারে ব্যথা
আমরা কি পারি তাহা?

মর্ম মূলের সুপ্ত ব্যথা!
মলিন মুখের বিষন্নতা!
দূরাতে কেন অনিহা?

বৈরিতা জনে জনে!
দূরত্ব তৈরি করে!
মিলাতে ক'জন পারে?

আছে যারা দুরাত্মা!
তৈরি করে শত্রুতা !
করিতে পারি মীমাংসা?

মিলে মিশে ভাই ভাই!
মোদের মাঝে ফাঁক নাই!
আমরা কি এমন চাই?

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান!
অস্থিরতার অবসান!
এই কি মোদের পণ?

এই সব হতে পারি!
এই সব করতে পারি!
এমন ক'জন ভাবতে পারি?

এই সব মোরা জানি!
এই সব দিতে পারি!
এমন মোরা ক'জন আছি?

না কি, এমন কিছু হবে নাহি!
এটাই কি শেষ নিয়তি?
না,না,না, বল উচ্চস্বরে!
হবে না তা, হবে নাহি!

জীবন যুদ্ধের এই যে গতি!
সরল পথে দিব না যতি!
এই হোক সবার মতি!

অ্যাগাথা ক্রিস্টি: অপরাধ সাহিত্যের রহস্যময় সম্রাজ্ঞী

সাইমুন সোহেল আবির

১৯২৬ সালের এক শীতের রাতে, গোটা ইংল্যান্ড চমকে উঠেছিল। বিখ্যাত রহস্য-লেখিকা অ্যাগাথা ক্রিস্টি হঠাৎ নিখোঁজ! তার গাড়ি পড়ে ছিল রাস্তার ধারে, ভেতরে ছিল কোট ও নোটবুক। এগারো দিন পর তিনি উদ্ধার হন এক হোটেল থেকে, নতুন পরিচয়ে। যেন নিজেরই কোনও উপন্যাসের চরিত্র!

১৮৯০ সালে ইংল্যান্ডের ডেভনের টরকুয়েতে জন্ম নেওয়া অ্যাগাথা ক্রিস্টি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন কল্পনাশক্তিতে সমৃদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নার্স হিসেবে কাজ করে ঔষধ ও বিষের জ্ঞান অর্জন করেন, যা পরবর্তীতে হয়ে ওঠে তার লেখার এক অনন্য উপাদান।

বোনের দেওয়া এক চ্যালেঞ্জ পূরণ করতে গিয়ে লেখা তার প্রথম উপন্যাস The Mysterious Affair at Styles (১৯২০)-এর মাধ্যমে জন্ম নেয় ইতিহাসখ্যাত গোয়েন্দা হারকিউল প্যারো। পরে আসে মিস মার্পল, এক বৃদ্ধা গোয়েন্দা, যার বিশ্লেষণী দৃষ্টি পাঠককে মুগ্ধ করে। তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলো হল:

Murder on the Orient Express.
Death on the Nile.
The Murder of Roger Ackroyd.
And Then There Were None.
Crooked House.
A Murder is Announced.
The ABC Murders
The Pale Horse

তার বই ১০০টিরও বেশি ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং ২ বিলিয়নেরও বেশি কপি বিক্রি হয়েছে, যা তাকে বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত নারী লেখিকার মর্যাদা দিয়েছে।

নাটক The Mousetrap পৃথিবীর দীর্ঘতম চলমান নাটক হিসেবে আজও থিয়েটারে চলছে।

চলচ্চিত্র এবং টিভি-জগতে অ্যাগাথার সৃষ্টি নতুন প্রাণ পেয়েছে। বিশেষ করে কেনেথ ব্রানার পরিচালিত ও অভিনীত নতুন সিনেমাগুলি দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে:

Murder on the Orient Express (2017)
Death on the Nile (2022)
A Haunting in Venice (2023)

এই চলচ্চিত্রগুলো আধুনিক স্টাইল ও ভিজ্যুয়াল ব্রিলিয়ান্সে পুরোনো গল্পগুলিকে নতুনভাবে উপস্থাপন করে আজকের প্রজন্মকেও আকৃষ্ট করছে।

তার ব্যক্তিগত জীবনও ছিল উপন্যাসের মতো নাটকীয়–প্রথম স্বামীর বিচ্ছেদ, পরে প্রত্নতত্ত্ববিদ ম্যাক্স ম্যালোয়ানের সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে, যার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বহু অভিযানে গিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা অনেক গল্পের পটভূমিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৯৭৬ সালে 'কুইন অফ ক্রাইম' নামে পরিচিত এই বিখ্যাত লেখিকার মৃত্যু হলেও, তার লেখা আজও পাঠকের হৃদয়ে ধাঁধার মতোই রহস্য রেখে যায়। অ্যাগাথা ক্রিস্টি কেবল লেখিকা নন–তিনি এক জগত, এক উত্তরহীন প্রশ্ন, এক চিরন্তন রোমাঞ্চ।

এবং শেষ পৃষ্ঠা উল্টে গেলেও, সেই চিরচেনা প্রশ্নটা থেকেই যায়–"কে করল হত্যা?" আর আমরা, পাঠকরা, সেই উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই ক্রিস্টির জাদুতে মগ্ন হয়ে যাই–প্রতিবার নতুন করে।

তার সম্পর্কে আরও জানতে ঘুরে আসতে পারো https://www.agathachristie.com এই ওয়েবসাইটটি।

SPICE OF THRILLER

আনার থেকে গ্রেনেড!!

কম সময়ে বড় হামলা করা কিংবা মুহূর্তে কোনকিছু উড়িয়ে দিতে বললে আপনার প্রথমে সবচেয়ে পরিচিত যে জিনিসটার কথা মনে হবে সেটা হলো গ্রেনেড। যুদ্ধের উপন্যাস কিংবা অ্যাকশন মুভি সবখানে আমরা দেখি এই গ্রেনেডকে। ফ্রান্স শব্দ Granade যার অর্থ আনার তার থেকে উৎপত্তি গ্রেনেড এর। শক্তিশালী ট্যাঙ্ক হোক কিংবা শত্রু বাঙ্কার মুহূর্তেই ধূলিসাৎ করতে জুড়ি নাই গ্রেনেডের।

অন্য আমি

আশরাফুল ইসলাম

(৪র্থ পর্ব)

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা।
অন্যন্যার সাথে কথা বার্তা বলার পর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা। যদিও অন্যন্যা গাড়ি দিয়ে বাসায় পৌঁছে দিতে চেয়েছিলো কিন্তু আমি হেঁটে যাবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।
অনেকটা মন খারাপ করেই অন্যন্যা চলে গেল।
সন্ধ্যায় পরিবেশ টা দারুণ লাগছে। ল্যাম্পপোস্টের আলো। হাল্কা বাতাস। রিক্সার ক্রিং ক্রিং বেল বাজানোর শব্দ।
এসময় এক কাপ কড়া লিকারের লাল চা হলে বেশ হতো। কিন্তু আশেপাশে কোনো দোকানও দেখছিনা। মনের ভেতর নানানপ্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।
হঠাৎ ফোনে অপরিচিত নাম্বার থেকে মেসেজ...
"কেমন আছেন? অনেক শুকিয়ে গেছেন। তাই অনুরোধ থাকবে নিজের খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।"
মেসেজের নাম্বারটা পরিচিত হলেও নাম্বারের মালিক পরিচিত নয়।
কেননা এ নাম্বার থেকে প্রায়ই মেসেজ আসে কিন্তু পরিচয় দেয়নি। আমারও কখনো ইচ্ছে হয়নি রিপ্লাই দেয়ার কিংবা পরিচয় জানার।
রাতে আড্ডা দেয়ার জন্য কাউকে পেলামনা। যদিও রাতের বেলা আড্ডা দিতে ভালোও লাগেনা।
হাঁটতে হাঁটতে বাসার কাছে চলে আসতেই মিথির ফোন।
- হ্যালো ভাইয়া...
- হ্যাঁ বল।
- কোথায় তুই? রাত হয়ে যাচ্ছে। মা চিন্তা করছে। এখনো বাসায় আসছিস না কেন?
- আমি এখনো ছোট নাকি যে রাত করে ফিরলে চিন্তা হবে?
- আমি কিচ্ছু জানি না, মা ফোন দিতে বলল তাই দিলাম। আর আমার জিনিসটা আসার সময় যেন নিয়ে আসা হয়।
- কিসের জিনিস?
- আমার জন্য আইসক্রিম আনার কথা ছিল ভুলে গিয়েছিস?
- এই তোর না ঠান্ডা লেগেছে তাহলে এসময় আইসক্রিম খাবি নাকি?
- আমি খাবো, তুই না আনলে তোর সাথে আর কথা নেই।
- না আনব না, তোর এখন আইসক্রিম খেয়ে কাজ নেই।
মিথি রাগে ফোনটা কেটে দিল।
আমি মুচকি হেসে ফোনের স্ক্রিনে তাকিয়ে আছি আর ভাবছি। পাগলিটা কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেল। এইতো সেদিনের কথা কাঁধে করে নিয়ে ঘুরতে হতো আর আইসক্রিম খাওয়াতে হতো। আইসক্রিম না নিলে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে দিবে।
বাসার কাছেই মোড়ে গিয়ে ওর পছন্দের আইসক্রিম নিয়ে বাসার দিকে আগাচ্ছি।
বাসার কাছে আসতেই অনন্যার ফোন।
- হ্যালো, আবিদ, কোথায় তুমি?
- এইতো বাসার নিচেই।
- ওহহ, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? সেই কখন না বের হয়ে গেলে? বললাম গাড়ি করে তোমায় নামিয়ে দেই। মুখের উপর না করে দিলে।
- হেঁটে আসাতে সময় লেগেছে। আর মিথির জন্য আইসক্রিম নিয়ে আসলাম।
- মিথিকে অনেক দিন দেখিনা। বাসায় একদিন নিয়ে গেলে না যে আন্টির সাথে আড্ডা দিব।
- ঠিক আছে, নিয়ে আসব একদিন।
- হ্যাঁ, এটাতো ২ বছর ধরেই নিয়ে যাচ্ছো।
বুঝতে পারছি অন্যন্যার এখনো রাগটা কমেনি। আর রাগ হবারই কথা। সে পরিচয় হবার কিছু দিন পর থেকেই বাসায় আসতে চায় কিন্তু আমিই নিয়ে আসিনি। কেননা সে ধনাঢ্য পরিবারের মেয়ে আর আমরা মধ্যবিত্ত। যদিও তার মাঝে এতটুকু অহংকার বোধ নেই। কিন্তু তারপরও আমার ইচ্ছে হয়নি কখনো।

পরদিন ভার্সিটিতে ঢুকতেই অনেক লোকের শোরগোল শোনা যাচ্ছে। এগিয়ে যেতেই দেখি একটা ছেলে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। গায়ের কাপড় বাজে ভাবে ছেড়া আর রক্ত মাখা। এমন দেখাচ্ছে যেন কেউ তার উপর হাজার বছরের জমানো রাগ একদিনেই হাসিল করে নিয়েছে। পাশেই পড়েছিলো একটা রুমাল।
(মনে হয় সেটা কেউ খেয়াল করেনি। তবে রুমালটা চেনা চেনা লাগছে।)
পাশেই দেখলাম প্রিন্সিপাল স্যার, সুভাষসহ আরো অনেকেই। আমাকে দেখে সুভাষ এগিয়ে আসলো আর বলল ভাইয়া এসেছেন। এদিকে তো অনেক হট্টগোল হয়ে গেল।
আমি বললাম কি হয়েছে?
সুভাষ: গতকাল আমরা প্রোগ্রাম শেষকরার পর সবাই যে যার মতো চলে যাই, কিন্তু কয়েকজন থেকে যায় আড্ডা দেয়ার জন্য। যার মধ্যে এ ছেলেটাও ছিলো।
আবিদ: তাদের বাকিরা কোথায়?
সুভাষ: তাদের সবাই এখানে কিন্তু একটা মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
আবিদ: মেয়ে?
সুভাষ: হ্যাঁ ভাইয়া। তাদের আড্ডায় তিনজন মেয়েও ছিলো কিন্তু তাদের মাঝে দুইজন মেয়ে হোস্টেলেই আছে আর

একজন কাল রাতে নাকি তাড়াহুড়ো করে বাড়িতে গিয়েছে। বাড়িতে নাকি তার বাবা অসুস্থ।
কথা বলতে বলতেই ক্যাম্পাসে পুলিশ চলে এলো। ওসি সাহেব প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে ছেলেটার ব্যপারে কথা বলছেন। আর দুইজন পুলিশ অন্যান্য স্টুডেন্টদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে।
সুভাষকে বললাম মেয়েটা কে, আর যারা ছিলো তারাকিছু বলতে পারে না?
সুভাষ জানালো তারা যে যার রুমে ছিলো আর ছেলেটা ঐ দিন রাতে একাই রুমে ছিলো। আরো খোঁজ নিয়ে যা জানতে পারলাম ছেলেটার কোন বাজে নেশা ছিলো না এমনকি কোনো গার্লফ্রেন্ডও ছিলো না। না ছিল কোন শত্রু।
তাহলে কে এভাবে নৃশংস ভাবে হত্যা করলো?
এদিকে মেয়েটাও হঠাৎ করে চলে গেল।
ছেলে আর মেয়েটার চলে যাওয়ার মধ্যে কোন মিল নেই তো?
পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের পর যে যার মতো চলে গেল। মৃতদেহটা পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠানো হলো।
কয়েকজন পুলিশ ছেলেটার রুম ও কলেজের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি করছে। প্রিন্সিপাল স্যার, ওসি সাহেব, আমিসহ কলেজের কয়েকজন সিনিয়র স্টুডেন্ট প্রিন্সিপাল স্যারের রুমে এসব নিয়েই কথা বলছি।
এর মাঝে একজন সাদাপোশাক ধারী পুলিশ তাড়াহুড়ো করে রুমে ঢুকেই বলল, স্যার আরেকটা ডেডবডি।
আমরা সবাই হতবাক হয়ে গেছি।
ওসি সাহেব বললেন, কি, আরো একটা! কোথায় সেটা?
পুলিশ জানালো স্টোর রুমের পেছনের ফাঁকা জায়গাটায়।
সবাই তড়িঘড়ি করে গিয়ে পৌঁছালাম এবং দেখলাম একটা মেয়ের নিথর দেহ পড়ে আছে। গায়ের জামাটা ছেঁড়া। বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন।
একেও পোস্টমর্টেম করার জন্য নিয়ে গেল।
ওসি সাহেব প্রিন্সিপাল স্যারকে বললেন।
দেখুন স্যার এরকম ঘটনা আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা আশা করিনি। কেননা আজ পর্যন্ত কোনদিন এ কলেজে মারামারি হয়েছে বলে কেউ বলতে পারবে না।
প্রিন্সিপাল স্যার জানালেন, প্রত্যেককে আমি সন্তানের মতো দেখি। তাই অপরাধী যেই হোক তার শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।
ওসি সাহেব হ্যাঁ সূচক বলে চলে গেলেন।
প্রিন্সিপাল স্যার সহ অন্যান্য শিক্ষকরা গভীর চিন্তায় বিভোর। এমন কোন সূত্র নেই যার কারণে এমন হত্যাকাণ্ড হতে পারে।
অন্যদিকে যে মেয়েটা চলে গেছে, তার খোঁজ নিয়ে দেখা গেল তার নাম মিরা। অনার্স ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী। বাড়ি বগুড়ায়।
পুলিশ তার ঠিকানায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো সে

বাড়ি পৌঁছায়নি।
মানে সে কলেজ থেকে বের হয়েছে কিন্তু বাড়ি যায়নি।
কলেজের ঘটনা শুনে তার বাবা-মা ও চিন্তিত।
তদন্তের স্বার্থে তার থাকার রুম চেক করে সন্দেহ হওয়ার মতো কিছু না পাওয়ায় পুলিশের টিম পুনরায় কলেজে ফিরে মিরার হোস্টেল রুম চেক করে অদ্ভুত দেখতে একটা রুমাল পেল। ঐ রকমই যেটা ছেলেটার লাশের পাশে ছিলো। রুমালটা অদ্ভুত বলার কারন, রুমালটার গায়ে সেভেন স্টার লেখা। আর রুমালটা আমিও অন্য কোনো জায়গায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।
মনে মনে ভাবতে লাগলাম তাহলে মিরাই কি হত্যাকারী? একটা রুমাল ছাড়া আর সূত্র নেই।
তাহলে ঐ মেয়েটাকে হত্যা করলো কে? আর কেন হত্যা করলো?
মাথা ঝিম ঝিম করছে।
পড়ে যাবো যাবো এরকম অবস্থায় হঠাৎ কোথা থেকে যেন অন্যন্যা এসে আমায় ধরে ফেলল।
আর কিছু মনে নেই।
যখন জ্ঞান ফিরলো তখন দেখি আমি বাসায় নিজের রুমে মিথি মাথায় পানি ঢালছে আর মা বসে কাঁদছে।
তেমন কিছু মনে করতে পারছিনা। পরে মনে হলো অন্যন্যা আমি পড়ে যাওয়ার সময় আমায় ধরেছিলো।
মাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি এখানে কিভাবে এলাম? আমি তো কলেজে ছিলাম। তখন মিথি বলল, অন্যন্যা আপু বাসায় নিয়ে এসেছে। তুই নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলি তাই।
সে কি চলে গেছে?
মা বলল, হ্যাঁ। তাকে বসতে বললাম কাজ আছে বলে চলে গেলো। ভারি মিষ্টি মেয়ে। আর যাওয়ার সময় বলে গেল, তুই যেদিন তাকে নিজে থেকে বাসায় নিয়ে আসবি ঐদিন ই নাকি বসে আড্ডা দিবে আমাদের সাথে। এর আগে না।
আমি মাকে বললাম আমার ঘুম পাচ্ছে।
ঠিক আছে বাবা, ঘুমিয়ে নে একটু।
আমি ঘুম পাচ্ছে বলেই ঘুমিয়ে গেলাম আর চোখ বন্ধ করার সাথে সাথেই স্বপ্ন দেখা শুরু। "অন্ধকার থেকে কেউ একজন বলছে, আবিদ চলে যেও না। বাঁচাও আমাকে। তুমি ছাড়া কেউ নেই আমাকে বাঁচাবার। আবিদ, আবিদ, শুনতে পাচ্ছো?"
তার চেহারাটা ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা।

(চলবে)

সঙ্কটের আহ্বান

সোমবারে সঙ্কট এর এই সংখ্যাটি আশা করছি সবার ভালো লেগেছে। এই সংখ্যাটি আপনার কেমন লেগেছে তা জানাতে ভুলবেন না আমাদের। আপনার রিভিউ, সমালোচনা বা কোন মতামত জানাতে পারেন সোমবারে সঙ্কটের Facebook এ।

সোমবারে সঙ্কটের পরবর্তী সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। লেখার বিষয়বস্তু, পাঠানোর নিয়ম ও পাঠানোর শেষ সময় সব পাবেন সোমবারে সঙ্কট Facebook page এর পিন পোস্টে। তাহলে দেরি না করে সঙ্কটের আহ্বানের সাড়া দিয়ে শীঘ্রই পাঠিয়ে দিন আপনার লেখা। এছাড়া আর কোন তথ্য জানার দরকার হলে যোগাযোগ করতে পারেন সোমবারে সঙ্কটের মেসেঞ্জারে বা ই-মেইলে।

ই-মেইল : mondaycrisis0824@gmail.com
ফেসবুক : https://www.facebook.com/mondaycrisis

Scan করুন